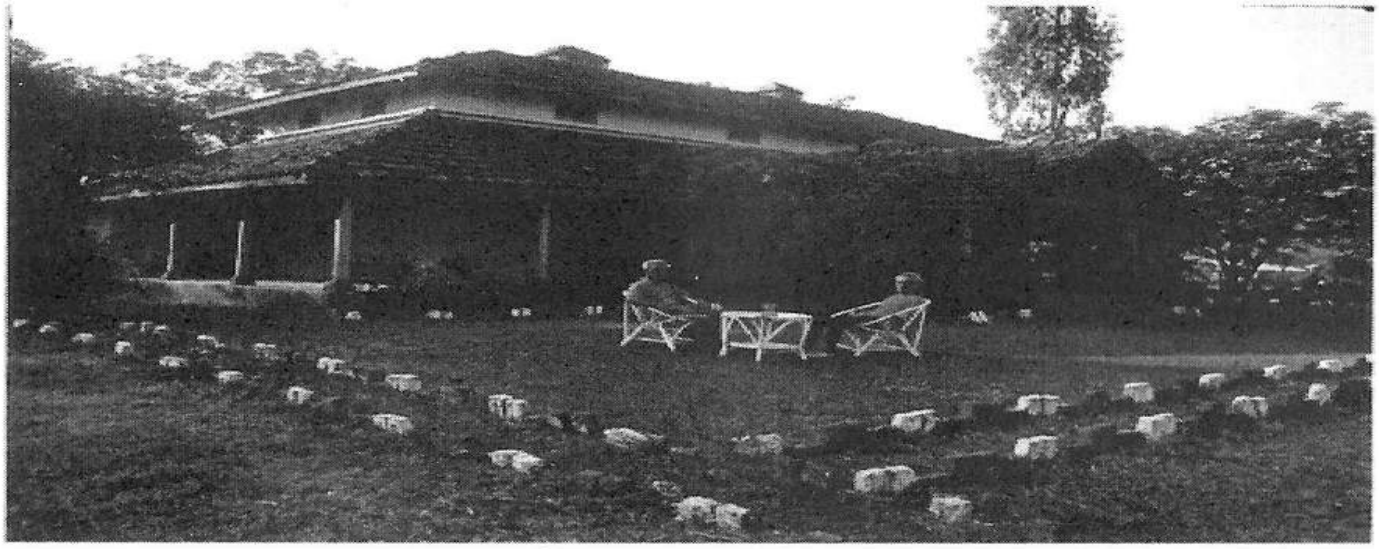

ছবি রতনলাল বিশ্বাস

বনে বনে বেড়াই

অরূপ বসু

(সাংবাদিক লেখক)

সেসব অনেককাল আগের কথা। এখন যেটা উত্তরাখণ্ড তারই অন্তর্গত কুমায়ুন হিমালয়। রুদ্রপ্রয়াগ, নৈনিতাল, কালাধুঙ্গির জঙ্গল এরই অন্তর্গত। এই জংলী পথে তীর্থযাত্রীরা যেতেন। মাঝেমধ্যেই চিতার খপ্পরে পড়তেন। পরাধীন ভারত। জাহাজ তৈরির জন্য কাঠ দরকার। রেললাইন পাতার জন্য কাঠের স্লিপার দরকার। সব কাঠই আসবে ভারতের গভীর জঙ্গল থেকে। ভারতের গভীর জঙ্গলে দ্রুতগতিতে প্রায় রেললাইন পাতার কাজ চলছে। সেইসময় কালাধুঙ্গির জঙ্গলে রেললাইন পাতার কাজ তদারকির চাকরি করতেন বিশ্ববিখ্যাত আরণ্যক বিষয়ক লেখক এবং শিকারী জিম করবেট। করবেট তাঁর লেখায় এটা বুঝিয়ে দিয়েছেন। তিনি যতটা বড় শিকারী তার চেয়ে বড় অরণ্য ও আরণ্যক পশুপ্রেমী। জোরের সঙ্গে বলেছেন জীবনে এমন একটি বাঘও মারেন নি যা মানুষখেকো নয়। জীবনে ঘুমন্ত কিংবা বিপন্ন অবস্থায় কোনো বাঘকে মারেন নি। এনিয়ে একটা দারুণ গল্প আছে। অলকানন্দার পাড়ে রুদ্রপ্রয়াগ। মাঝেমাঝে চিতার আক্রমণে মানুষের মৃত্যু ঘটছে। আতঙ্ক রেললাইনের কুলি বস্তিতেও পৌঁছেছে। স্থানীয় প্রশাসন করবেটের সাহায্য চেয়েছে। অনেকরকমভাবে ফাঁদ পেতেও চিতাটাকে বাগে আনা যাচ্ছে না। লোহার দাঁতালো ফাঁদে থাবা আটকে যাওয়ার পরও সে পালিয়ে যাচ্ছে। এতটাই চতুর যে বন্ধ ঘরে ঢুকে বৃদ্ধাকে নিয়ে বাতাস আসার ঘুলঘুলি দিয়ে বেড়িয়ে যাচ্ছে। অন্যরা টের পাচ্ছে না। একটা বাড়ি থেকে খবর এল এক বৃদ্ধাকে নিয়ে গেছে। বাঘের পায়ের থাবা কোন দিয়ে কিভাবে এসেছে বোঝার জন্য করবেট গেলেন। দেখলেন বন্ধ ঘরে বৃদ্ধা একটা দিকে ছিল। আরেক দিকে

জোয়ান লোকেরা মাথার কাছে লাঠি, বল্লম নিয়ে ঘুমোচ্ছিল। ঘরে বাতাস আসার একটা বড় গর্ত দেওয়ালের ওপরের দিকে। গর্তের কাছে একটা কলসিও রাখা। বাঘটা ওই গর্ত দিয়ে ঢুকেছে। কলসিটা একটু সরিয়েছে। বৃদ্ধাকে মুখে করে ঐ গর্ত দিয়ে বেড়িয়ে গেছে কলসিটাও পড়ে যায়নি। শুধু রক্তের দাগ আর পায়ের ছাপ রেখে গেছে। করবেট তাঁর লেখায় অনেকবারই বলেছেন আমরা যেমন মানুষখেকো চিতাকে অনুসরণ করতাম চিতাও করত। তাই কিছুটা পথ জঙ্গলে যাওয়ার পর পায়ের ছাপ হারিয়ে যেত। অনেক সময়ই দেখা যেত বাঘটি গাছের ওপর থেকে শিকারীদের উপর নজর রাখছে। যাহোক সেবার এইরকম একটি মানুষখেকো চিতার জন্য বেশ কয়েকদিন ধরে জঙ্গলের নানা দিকে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। যখন যেদিকে যাচ্ছেন চিতা শিকার করছে। তার উল্টোদিকের কোনো বনবস্তি কিংবা রেললাইনের কুলিবস্তিতে। সেদিন সারারাত জঙ্গলে নদীর ওপর ঝুলন্ত সেতুর মুখে রাত কাটিয়ে বন বাংলোতে ফিরেছেন ক্লান্ত, হতাশ। বাংলোর দোতলায় সবে বারান্দায় এসে বসেছেন। বন্দুকটা চেয়ারের কাছে দেওয়ালে ঠেস দেওয়া। হঠাৎ বাংলোর নিচে পায়ে চলার পথের দিকে তাকিয়ে স্তম্ভিত হলেন। সেই চিতাটা (বোধহয়) ধীরে ধীরে বাংলোর হাতা থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে বন্দুকটি হাতে তুলে গুলি প্রায় করেছেন শেষ মুহূর্তে বন্দুকটি নামিয়ে রাখলেন। চিতাটি তখন পায়ে চলার পথের শেষপ্রান্তে যেখানে গভীর বনের শুরু সেখানে দাঁড়িয়ে পিছন ফিরে দেখছেন। যেন বলছে আবার দেখা হবে! করবেট লিখেছেন ঐ চিতাও জানে আমার পিঠে যে বন্দুকটি ঝুলছে সেটা ভয়ঙ্কর তাই পিছন পিছন বাংলো অবধি এসেও আক্রমণ করেনি। কখন আমি নিরস্ত্র হব তার অপেক্ষায় দীর্ঘ সতর্ক পথ আমাকে অনুসরণ করেছে। তাই ভাবলাম ও যখন পেছন থেকে আমাকে আক্রমণ করেনি আমিই বা পেছন থেকে ওকে গুলি করব কেন?

করবেটের সঙ্গে বাঘের সম্পর্ক নিয়ে গল্প শোনানোর জন্য এ লেখাটা শুরু করিনি। শুধু করবেট ও জঙ্গলের নিবিড়তা আমাকে স্পর্শ করে বলে এটুকু এসে গেল। যেটা বলছি সেটা হচ্ছে করবেটের সত্যিকারের আরণ্যক মানুষের সান্নিধ্যের কাহিনি। টারজান কিংবা মংলীর কাহিনি জানে না এমন লোক পাওয়া ভার। ওরা দুজনেই অন্য বন্য প্রাণীদের মতই জঙ্গলে ঘুরে বেড়াত। আরণ্যক প্রাণীদের সঙ্গে তাদের ভাষায় কথা বলত। আরণ্যক প্রাণীদের অনেকেই তার বন্ধুবান্ধব। কিন্তু এসবই কাল্পনিক চরিত্র। বহুবার মনে প্রশ্ন জেগেছে, তারা কি আরণ্যক এইরকম চরিত্রের খোঁজ কোথাও পেয়েছিলেন, যার কাহিনি তারা শুনেছেন কিন্তু চোখে দেখেননি। তাই সেই শোনা কাহিনীকে লেখক নিজের কলমের জোরে বাস্তব চেহারা দেওয়ার চেষ্টা করেছে। রুডিয়ার্ড কিপলিং জীবনের বেশিরভাগটাই মধ্যপ্রদেশের পেইঞ্চ অঞ্চলের জঙ্গলে কাটিয়েছেন। মংলীর মত সৃষ্ট চরিত্র তাকে নোবেল প্রাইজ এনে দিয়েছে। বুদ্ধদেব গুহ মনে করেন আরণ্যক লেখায় জিম করবেট কিপলিং-এর চেয়ে অনেক এগিয়ে।

করবেটের তাই নোবেল প্রাইজ পাওয়া উচিত ছিল। কিন্তু বুদ্ধদেব গুহ করবেটের সেই আশ্চর্য অভিজ্ঞতার কথা শোনেন নি বা পড়েন নি।

কালাধুঙ্গির কুলিলাইনে, রেলবস্তিতে মাঝে মাঝেই খবর আসত, জঙ্গলের ভেতরে এক কিশোরী আছে যে বানরের চেয়েও স্বচ্ছন্দ গতিতে এক গাছ থেকে আরেক গাছে লাফিয়ে লাফিয়ে চলে যায়। মানুষের ভাষায় কথা বলে না। পশুর মতো নানারকম শব্দ করে তাতে অন্য পশুরাও সাড়া দেয়। তার গায়ে কোনো পোশাক নেই। পশুর চেয়ে কম মানুষের চেয়ে বেশি লোম আছে তার গায়ে। করবেট রেলকুলিদের নিয়ে অভিযান চালালেন যেদিন সত্যি সত্যি দেখলেন নির্দেশ দিলেন যত কষ্টই হোক ফাঁদ পেতে ওকে ধরো দেখবে ওর যেন কোনোরকম আঘাত না লাগে। তাকে সেইভাবে ধরা হল। নিয়ে আসা হল কুলিবস্তিতে। সেখানে একটা ছোটো হাসপাতাল ছিল। তারই একটি ঘরে তাকে বন্ধ করে রাখা হল। করবেটের অসুস্থ বোন তার সঙ্গেই থাকতেন। তার উপর দায়িত্ব পড়ল আরণ্যক কিশোরীর দেখভাল করার। দড়ি দিয়ে বেঁধে আনার সময় কিশোরী ধস্তধস্তি করেছে। তাতে তার গা হাত পায়ের অনেক জায়গায় কেটে গেছে। প্রথমে বাধা দিলেও পরে ওষুধ লাগাতে দিল। কিন্তু মানুষের তৈরি কোনো খাবারই খেল না। পরে তাকে কাঁচা মাংস ও আরণ্যক ফল খেতে দেওয়া হল। তা একটু আধটু খেল। দেখা গেল সে হাত দিয়ে খায় না। পশুর মতো মাটিতে মুখ দিয়ে খায়। আঙুলের ব্যবহার জানেনা। করবেট ইংল্যান্ডে খবর পাঠালেন দ্রুত নৃতাত্ত্বিক ও জীববিজ্ঞানীদের পাঠানোর জন্য যাতে কিশোরীটিকে নিয়ে উপযুক্ত গবেষণা হয়। মানুষের বিবর্তনের ইতিহাসের কোনো নতুন অজানা পথের খোঁজ পাওয়া যায়। ইংল্যান্ড থেকে বৈজ্ঞানিকরা এলেন। তবে বড় দেরিতে। ততদিনে আরণ্যক কিশোরীটি মারা গেছে। করবেট দুঃখ করে লিখেছিলেন। মানব ইতিহাস নিয়ে গবেষণা করার একটা দারুন সুযোগ হারালাম।

সেইসময়কার সংবাদপত্রে এ খবরটা বেরিয়েছিল।

হিমালয়ে ইয়েতিদের কথা প্রায়ই শোনা যায়। একবার তো এক বিকট দর্শন পশুর মাথা ও ছাল নিয়ে যাওয়া হয়েছিল ইংল্যান্ডে। এই পত্রিকারই দ্বিতীয় সংখ্যায় হিমালয় বিশেষজ্ঞ কঙ্কন রায় সেকথা লিখেছিলেন। পরে বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায় দেখা যায় ওটা একধরনের ভাল্লুকের। কিন্তু নৃতত্ত্ববিদেরা অনেকেই বলেন শ'চারেক বছর আগেও আপার হিমালয়ে বিগ ফুট ম্যান ছিল। তাদেরই ইয়েতি বলে কেউ কেউ বর্ণনা করেন। সুনীতি পাঠকের কাছে শুনেছি তিব্বতী গ্রন্থে এরকম মানুষের কথা কোথাও কোথাও লেখা আছে। ২০১৫ সালের গোড়ায় আফ্রিকায় হোমোনালদেন বা প্রাচীন মানুষ (মিসিং লিঙ্ক)-এর খোঁজ পাওয়া গেছে। আধুনিক নৃতত্ত্ববিদরা বলে থাকেন বহুকাল আগেই মানুষদের একটা প্রজাতি যেমন আরণ্য বাগান, ও কৃষিভিত্তিক জীবনের দিকে

চলে আসে। আরেকটি প্রজাতি কিন্তু অরণ্য নির্ভর জীবনকেই বেছে নিল। আজও পৃথিবীর অনেক জায়গায় গভীর অরণ্যে মানুষ শিকার ক'রে, গাছের ফলমূল খেয়ে বেঁচে থাকে। গাছের উপরই বাসাবেঁধে থাকে। তীরধনুক দিয়ে খরস্রোতা নদী থেকে মাছ ধরে এদেরও তো একটা সমাজ আছে সভ্যতা আছে। সমস্যা হল যারা কৃষি ও নগরভিত্তিক মানবপ্রজাতির তারা শুধু কাঠ, খনিজ, জ্বালানীর প্রয়োজনে অরণ্য ধ্বংস করে না! ঐ মানব প্রজাতিকে নিজেদের মত করে গড়তে চায় নইলে নিকেশ করে দেয়। ভারতের অরুণাচল প্রদেশে লিসু বলে একটা জায়গায় আজও মানুষ গাছে বাস করে, শিকার করে খায়। সিকিমের জঙ্গু উপত্যকায় গিয়ে দেখেছি খরস্রোতা নদীতে তীর ছুঁড়ে মাছ ধরছে লেপচারা। আজও জঙ্গুতে যেতে গেলে সিকিমবাসীদেরও আলাদা পারমিট লাগে। আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের বেশিরভাগটাই আজও রহস্যে ঘেরা। সুপ্রীম কোর্টের নির্দেশের পর শহুরে মানুষের নগ্ন জারোয়া যুবতীর সঙ্গে দাঁড়িয়ে ছবি তোলার অভ্যাসটা বন্ধ হয়েছে।

ইউরোপীয়রা আধুনিক পৃথিবীর সবচেয়ে সভ্য বলে নিজেদের জাহির করে। গত শতাব্দীর গোড়ায় প্রচুর কাঠের খোঁজে ইংরেজরা এই দ্বীপে হানা দেয়। সংঘাত বাধে এখানকার আদিবাসীদের সঙ্গে। প্রথম দিকে মারধোর খেয়ে ফিরে এসেছিল, বিষাক্ত তীর সামলাতে না পেরে। পরে আরও দলবল নিয়ে হাজির হয়, ঘাঁটি গাড়ে তখন, আদিবাসীদের কব্জা করতে পারে। ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের ৩১শে ডিসেম্বর পোর্টব্লেয়ার অঞ্চলে আদিবাসীদের সঙ্গে প্রবল সংঘর্ষ হয়। বিশেষ করে যেখানে সেলুলার জেল সেই অংশটায়। একটি আদিবাসী বালক জীবন্ত ধরা পড়ে। তার ভাষাও কেউ জানে না। তখন ছেড়ে দেওয়া হয়। কিন্তু সেই বালকটি ঐ জায়গাটি ছেড়ে যায় না। কারণ তার আপনজনেরা ওখানেই মারা গেছে তার ঠিকানা ওরই চারপাশ।

১৮৮৩ সালের জুলাই মাস। আন্দামানের ৬ জন আদিবাসীকে (৪ জন পুরুষ ২ স্ত্রীলোক) নিয়ে এসে ব্রিটিশ ইন্ডিয়ার রাজধানী কোলকাতার আলিপুর চিড়িয়াখানায় রাখা হয়েছিল। বাঘ, সিংহের মত তাদেরও আলাদা খাঁচা ছিল। সেবার শীতের কোলকাতাকে উপভোগ করার বাড়তি আকর্ষণ ছিল 'রাক্ষস মানুষ'। বিদেশীদের দেখা দেখি দেশী শিক্ষিত মানুষেরাও টিকিট কেটে এই ভারতবাসীদের চিড়িয়াখানায় দেখতে গিয়ে।

১৯৩৩ সনে কলকাতায় 'হেগেন বেগ সার্কাস' আসে। পার্কসার্কস ময়দানে তাঁবু পড়েছিল। তাদের খেলার সবচেয়ে বড় আকর্ষণ ছিল 'রাক্ষস মানুষ' নামে কয়েকজন আদিবাসীকে দেখানো। সেবার অবশ্য কলকাতার মানুষ বয়কট করেছিল।

এই সেদিন পর্যন্ত ভ্রমণবিলাসী মানুষদের একটা বড় অংশই আন্দামানে যেত যতটা না সমুদ্র এবং সবুজ দ্বীপের টানে তার চেয়ে অনেক বেশি নগ্ন আদিবাসীদের দেখতে।

একবার এক নৃতত্ত্ববিদের কাছে আন্দামানে আদিবাসী নিয়ে খুব আকর্ষণীয় একটি

গল্প শুনেছিলাম। সেটা আন্দমানী, ওঙ্গি, না জারোয়া সেটা এখুনই মনে পড়ছে না। তবে ঘটনাটি এরকম। এক শিখ নৃতত্ত্ববিদ তখন আন্দামানে কাজ করছেন। এই দলটার অন্যতম কাজ আধুনিক মানুষদের মত ওদের গড়ে তোলা। পোশাক আশাক বালতি শহুরে জীবনে ব্যবহার্য নানা সামগ্রী বনের বাইরে পথের ধারে রেখে দিত। একটু দূরে শিবির করে সেইরকম জিনিসের ব্যবহার নিজেদের মধ্যে করত। দূর থেকে আদিবাসীরা যাতে তা দেখে অনুকরণ করে। তাতে কখনো কাজ হচ্ছিল কখনো হচ্ছিল না। ঐ শিখ যুবকের একটু বেশি সাহস। সে বনের ধারে একেবারে ঐ আদিবাসী গোষ্ঠীর কাছাকাছি চলে যাচ্ছিল এমনকি বোবা মানুষের মত ইঙ্গিতে কিছু বলাবলিও চলছিল। হঠাৎ একদিন একদল আদিবাসী যুবতী ঐ শিখ যুবককে নিয়ে গভীর জঙ্গলে চলে গেল। বেশ কিছু দিন তার আর খোঁজ পাওয়া গেল না। নিয়ম অনুসারে জঙ্গলের ভিতর তার খোঁজে লোক পাঠানো নিষেধ। হঠাৎ একদিন ওরাই ওকে কাঁধে করে পৌঁছে দিল ঠিক যেখান থেকে নিয়েছিল সেখানে। কিছুটা বিভ্রান্ত অবসন্ন এবং সম্পূর্ণ নগ্ন সেই যুবক।

পরে যুবকটি যা বলেছিল তা এরকম। ঘটনার দিন হঠাৎ এক যুবতী তাকে হাত ধরে টানতে টানতে একটু ভেতরে নিয়ে যায়। তার পর পুরোপুরি কাঁধে তুলে গভীর জঙ্গলে যায়। সেখানে গাছের ডালপালা দিয়ে ছোট ছোট কুঠুরি। এরকম একটি কুঠুরি ওই যুবতীর নিজের। শিখ যুবকটিকে নিয়ে সেখানে থাকতে শুরু করে। ওর মত করে শব্দ ভঙ্গিতে কিছু বোঝানোর চেষ্টা করে। গাছের ফলমূল, এক ধরনের ভেষজ তরল খেতে দেয়। যুবকটি কোনো কিছুই খেতে পারে না। ক্রমশই অসুস্থ হয়ে পড়ে। ওই যুবতীরা ওর চিকিৎসাও করে। মানে নানারকম পাতা খেতে দেয়। কিছুতেই কিছু হয় না। ক্রমশ অবসন্ন হয়ে পড়ে। তারপর একদিন সকালে ওকে সমুদ্রের পাড়ে দিয়ে যায়।

বনে বনে বেড়ানোর ফাঁকে নানারকম বনবাংলো দেখেছি। বনবসতির অদ্ভুত মায়া। সেখানকার মানুষের অদ্ভুত জীবন। বক্সা টাইগার রিজার্ভের ভেতর এই সেদিন পর্যন্ত একটা ডাকঘর ছিল। আন্দামানের সেলুলার জেলে যেমন সিপাহী আন্দোলনের সময় থেকে স্বাধীনতার পরবর্তী কমিউনিস্টদের ভারত সরকার বন্দী করে রাখত। তেমনি আর একটি ভয়ঙ্কর কারাগার ছিল ডুয়ার্সের বক্সা পাহাড়ের গভীর জঙ্গলে। সেই কারাগারটি ভেঙে গেছে ভূমিকম্পে এবং অবহেলায়। ডাকঘরে বন্দীদের অ্যাকাউন্ট ছিল তা আগলে রাখতেন যে ঐতিহাসিক মানুষটি তিনি মারা যাওয়ার পর ডাকঘরটির হাল খারাপ। তবে এটা এমন একটি ডাকঘর যেখানে আজও রানার আছে। তার নাম শেরিং ডুকপা। সে কখনও কোনো গাড়িতে চড়েনি।

জঙ্গলে এক রানার

শেরিং ডাকপা। রানার। বাংলার শেষ রানার। দিনের পর দিন, মাসের পর মাস বক্সা

পাহাড়ের আরণ্যক গ্রামে খবর পৌঁছে দেওয়া তার কাজ। বাবাও এই কাজ করতেন। বাবার আগে তাঁর বাবা। বক্সা পাহাড় এখন বক্সা টাইগার রিজার্ভ। সরকারি হিসেবে ২৯টি বাঘ আছে। ডুকপা গাঁয়ের মানুষের ধারণা ১৫টি বাঘ আছে। চিতা বাঘ কত, তা কেউ শুনে দেখেনি। সাপ, শুয়োর, শেয়াল, ভালুকের গোনার প্রসঙ্গ ওঠেই না। দুর্লভ, বিষাক্ত মাকড়শা, পোকা এখানকার পাহাড়-গ্রাম-জঙএগলর একটা বড় সম্পদ। শেরিংযের আরও ১৩ বছর চাকরি আছে। সরকারি খাতায় ১৩০০ টাকার ডাকপিওন বা মেল রানার। একদিন অন্তর ১৩ কিলোমিটার পাহাড়-জঙ্গল, বক্সা নদী, কালা নদী পেরিয়ে জয়ন্তীতে যায়। বাস ফসকে গেলে সেখান থেকে আরও ১৬ কিলোমিটার ছুটে আলিপুরদুয়ার ডাকঘর। ডাকের বোঝা নিয়ে ফের বক্সা পাহাড়। শেরিং বাসে চড়তে ভয় পায়। ২০০০ ফুট ওপরে বক্সা দুর্গের কাছে বক্সাদুয়ার ডাকঘর। সেখান থেকে চিঠি, টাকা, খবরের কাগজ বিলি করতে করতে কোনোও দিন ২৫০০ ফুট ওপরের চুনাভাটিতে নিজের ঘরে ফেরে, কোনও দিন সাতলুং নদী পেরিয়ে ৫৬০০ফুট ওপরে তপগাঁও, কোনদিন লেপচাখা হয়ে বক্সা ঝোরার গা দিয়ে লালবাংলা, অসিগাঁও (৩১২৬ ফুট), বাচগাঁও (৪২৭৩ ফুট), ওমচুপানি (৫৮৮৮ ফুট) যায়। আসলে ঘরে ফেরা হয় মাসে একবার কি দুবার। সেদিনটা বড় আনন্দের। বক্সাদুয়ার ডাকঘরের পোস্টমাস্টার পুষ্পরাজ থাপা বাংলা, হিন্দি, ইংরেজি জানেন। বললেন, তিনি রানারকে কার কোনটা বুঝিয়ে দেন। দিনে ১৫টা চিঠি আসে। চিঠি আসে ফিনল্যান্ড, আমেরিকা, কানাডা, দক্ষিণ আফ্রিকা, বাংলাদেশে থেকে। চুনাভাটিতে খুব বড় ফিনল্যান্ডের চার্চ আছে। এ ছাড়া চুনাভাটি, অসিগাঁও, লেপচাখাতে বড় বৌদ্ধ গুম্ফা আছে। প্রতিদিন হাজার তিনেক টাকা মানি অর্ডারে যায় বা আসে। ১২টা ম্যাগাজিন, ৩৫টি ইংরেজি, ২টি বাংলা, ১টি হিন্দি, একটি নেপালি কাগজ আসে। এখন আবার লেপচাখা, বক্সাবাজার, চুনাভাটিতে সীমান্ত সুরক্ষা বাহিনীর শিবির হয়েছে। চিঠির বোঝা ভারী হচ্ছে। যেমন ছিল ১৯৩৫ বা ১৯৪৭ সালে বক্সা বন্দীশিবিরে স্বাধীনতা সংগ্রামী ও কমিউনিস্টরা বন্দী থাকার সময়ে, ১৯৬৪-তে তিব্বতি উদ্বাস্তু শিবির চালু থাকার সময়ে। এ পথ পুনাখা, পারো হয়ে তিব্বতের চুম্বি, লামা পর্যন্ত। এ পথে টাঙ্গন ঘোড়া, পশম, মৃগনাভি, গণ্ডারের খড়্গ, চীনা রেশম, ভুট কম্বল, গজদন্ত আসত। এখন আসে কমলা। আগের মতোই যায় গার্হস্থ্য সামগ্রী। সেরিং ডুকপার এ পথে ছুটতে তাই বেশ গর্ব হয়। শুধু কি চিঠি? মুখে মুখে ফৌছে দেয় কত লোকের কত খবর। পুলিস তাকে কত কী জিজ্ঞাসা করে। চোরাই কারবারি। সব জবাব তার কাছে নেই,দিতেও নেই, সেটা শেরিং জানে। তার সুবিধা, ডুকপা ছাড়া কোনও অক্ষর জানে না, কোহও কিছুতেই মুখের ভাব বদলায় না। ভেবেছিলাম শেরিংয়ের হাতে বর্শা থাকবে, লণ্ঠন থাকবে। না, তা নেই। ট্রেনে যখন বক্সাদুয়ার ডাকঘরে পৌঁছলাম, শেরিং বেরিয়ে গেছে। খোঁজ গেল চারদিকে। পরদিন চুনাভাটির দিকে রওনা হলাম। সঙ্গী গাইড নিমা ডুকপা।

পাহাড়ের গা বেয়ে রাস্তা। কোথাও দেড়-দু হাতের বেশি চওড়া নয়। গায়ে জড়িয়ে যায় মাকড়শার জাল। ঝিঁঝির বিচিত্র ডাক, ঠিক যেন মন্দিরে ঘন্টা বাজছে। এক জায়গায় ছোট্ট চাতালের মতো। কয়েকজন কিশোর খেলছিল। তাদের কাছেই খোঁজ পেলাম, শেরিং এখন বাড়িতে। আদমা, সদর, বাজার, লেপচাখা— ১৩টি গ্রামের চিঠি গেছে।

১৯২২-২৩ সালে ভারতের তথ্য ও জনসংযোগ দপ্তরের অধিকর্তা ছিলেন এল এফ রাশব্রুক উইলিয়ামস। তাঁর উপলব্ধি, 'শুধু এখন নয়, আগামী দিনেও রানাররাই ভারতীয় ডাক ব্যবস্থার মূল কাণ্ডারী। বন্যপ্রাণী, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, ডাকাতের অস্ত্র— কেউ তাঁদের দমাতে পারে না। এমনকি অপর রানারের মৃত্যুসংবাদও। আমার সময়েই হাইওয়েতে ৫৭ বার রানার ডাকাতের হাতে পড়েছে। এর মধ্যে ৭ জন রানার ডাকাতের হাতে প্রাণ হারায়। নদী পেরনোর সময় ৩ জন ডুবে যায়। ২ জন পাহাড়ি পথে যেতে গিয়ে ধসে চাপা পড়ে মারা গেছে।' তবু রানার ছুটছে। সুনীতিকুমার লিখেছেন, রোমান সাম্রাজ্যে পথঘাট তৈরির পরেই যোগাযোগের জন্য ছুটন্ত মানুষের ডাক পড়ে। তাদের দেখাদেখি দেশে দেশে পোস্টার রিলে স্টেশন হল। জাপানে ১ জন রানার ছুটত। একজন বাঁশের ডগায় লণ্ঠন বেঁধে ছুটত। আর একজন চিঠি ও টাকাপয়সার বোঝা নিয়ে পেছনে পেছনে ছুটত। পরে জাপানের মতো এশিয়ার সব দেশেই একজনই দুজনেরকাজ করতে শুরু করল। ডাক চৌকিতে রানার পৌঁছলেই আর এক রানার চিঠির বোঝা নিয়ে দৌড় শুরু করত। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির আমলে রানারের কাজটা আর একটু কঠিন হল। নিযুক্ত হল ঘড়িওয়ালা। সে দেখত রানার ঘন্টায় অন্তত ৫ মাইল বেগে ছুটেছে কি না। গ্রিক ঐতিহাসিক জেনোফোনের লেখা থেকে জানা যায়, ডাক চৌকির দূরত্ব ঠিক হত একটা ঘোড়া না খেয়ে একটানা কতটা ছুটতে পারে তার ওপর। এ দেশে সেটাই ছিক করা হয়েছে রানারকে দিয়ে। সব কালে সব দেশেই রানারের খাতির তার পা-ছুটের জন্যই। শোনা যা, এক সময়ে কোনও কোনও রানার নাকি দিনে ৬০ মাইড় যেত। ফেরিস্তা লিখেছেন, ভারতের কোনও কোনও রানার ১০ দিনে ১৪০০ মাইল যেত। মুঘল বাদশারা সোনামুগ ডাল ও মিহি চাল রানারের হাত দিয়ে দিল্লিতে আনাত। মহম্মদ বিন তুঘলক রানারদের হাত দিয়ে গঙ্গাজল আনাতেন। এ রকম পরিশ্রমের মূল্য কেমন? ১৮৩৫ সালে মাসমাইনে ৪টাকা। দিন বদলেছে। এখন আর হাতে বর্শায় বাঁধা লণ্ঠণ থাকে না। ১৯৫৩ সাল থেকেই রানার প্রথা তুলে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। কিন্তু যেখানেই পাহাড়, নদী, জঙ্গল, উপতকা পেরিয়ে চিঠি, টাকা পৌঁছে দিতে হয়, সেখানে আজ্য রানার আছে। হিমাচল প্রদেশে, কুমায়ুন ও গাএড়ায়াল হিমালয়ের পাহাড়ি গ্রামে, সিকিমে, আন্দামানে আছে। কিছুদিন আগেও অযোধ্যা পাহাড়ে ছিল। এখন শুধু বক্সা পাহাড়ের জঙ্গলে আছে। ওর অবসরের সঙ্গে সঙ্গে বাংলায় তারাশঙ্করের ডাকহরকরা, সুকান্তের রানার— যোগাযোগের দুর্নিবার অধ্যায় থেমে যাবে।

বক্সদুয়ার পোস্ট অফিস হেরিটেড তালিকায় ঢুকতে চলেছে। হয়ত রানার প্রথা বন্ধ হয়ে যাবে, তার বদলে ডাক এলেই ডাকঘরের মাথায় রঙিন পতাকা ওখানো, বিউগল বাজানো হবে। এখনই ২ কিলোমিটার বাড়তি পিচরাস্তা গেছে। বাকি পথটা পর্যটকদের জন্য যে প্রস্তাবিত রোপওয়ে, ডাক যাবে তাতেই। এই ডাকঘর স্বাধীনতা সংগ্রামীদের কাছেও মাইলস্টোন। ১৯৩০ সালের অক্টোবরে স্বাধীনতা সংগ্রামী প্রফুল্ল দত্ত বক্সা বন্দীশিবিরে যাওয়ার রময়ে লিখেছেন, 'বক্সা রোড স্টেশনের বাইরে ছোট ৭ টা খচ্চর। লোক ৯ জন। কেউ হেঁটে, কেউ খচ্চরের পিঠে যখন হাঁপিয়ে উঠেছি, হঠাৎ সামনে বক্সা পোস্ট অফিস।'

তখন মহকুমা। ১৯৬২ সালের আগে, বক্সাদুয়ার হয়ে বক্সা পাহাড়, বক্সা নদী, বালা নদী পেরিয়েই ছিল ভুটানের সঙ্গে ভারতের যাতায়াতের, বাণিজ্যের পথ। ভুটান রাজার তৈরি পাহাড় দুর্গকেই ইংরেজরা বন্দীশিবির করেছিল। ১৯৩৫ সালে এই বন্দীশিবিরে রাখা হয়েছিল স্বাধীনতা সংগ্রামীদের। ১৯৪৭ সালে পার্টি নিষিদ্ধ হওযার পর বাংলার কমিউনিস্ট নেতাদেরও এখানে রাখা হয়েছিল। এই বন্দীশিবিরের পাশেই কমান্ডান্ট ড্যানিয়েলের বাংলো। সেখানেই বক্সাদুয়ার ডাকগর। এটাকে হেরিটেজ ডাকঘর ঘোষণার দাবি উঠেছে। তখনকার পোস্টমাস্টার পুষ্পরাজ থাপা অজস্র হেরিটেজ প্রপার্টি আগলে রেখেছিলেন। নিজেই পোস্টমাস্টার জেনারেলকে চিঠি দিয়েছেন। এক পোস্টমাস্টার জেনারেলের উদ্যোগে যদি দার্জিলিঙের পোস্ট অফিস ঐতিহ্যশালী ডাকঘরের স্বীকৃতি পেতে পারে, এটা পাবে না কেন? পূর্ত দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী মনোহর তিরকিও উদ্যোগ নিয়েছিলেন। তাঁর ও এখানকার সাংসদ জোয়াকিম বাখলার বক্তব্য, 'এই ডাকঘরের সঙ্গে স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস, ভারতের কমিউনিস্ট আন্দোলনের ইতিহাস জড়িত। আন্দামানের চেয়ে এই বন্দীশিবির কম দূর্গম ছিল না। এই ডাকঘরেই ছিল তাঁদের বাইরে জগতের সঙ্গে একমাত্র সেতু। এখানে চিঠি আসত, কাগজ আসত, তাঁদের সামান্য টাকাপয়সা এই ডাকঘরেই গচ্ছিত থাকত। প্রিয়জনকে টাকাও পাঠাতেন এখান থেকেই। তখনকার মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যকে উদ্যোগ নিতে অনুরোধ করেছিলাম। তিনি কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে কথা বলবেন বলেছিলেন।' তখনকার সাংসদ জোয়াকিম বাখলাও কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলেছিলেন। নথিতে দেখা যাচ্ছে, ১৯৩৫ সালের ৪ জুলাই অ্যাকাউন্ট খুলছেন মোহিনীমোহন মজুমদার। অ্যাকাউন্ট নম্বর ৭১০৮। ছোট্ট মেয়ে সুরমারাণী মজুমদারকে তাঁর উত্তরাধিকারী করেছেন। সুধারাণী বসু, অ্যান্টনি দোরজি, কাইলুনা মাহুত, অশ্বিনীকুমার গুপ্ত, শৈলেন্দ্রনাথ সেন, আবদুল গফফরের মতো স্বাধীনতা সংগ্রামীর অ্যাকাটউন্টের পাশে কত কিছু লেখা। শুরু থেকে এই ডাকঘর রানার-নির্ভর। ১৭৯০ থেকে ভারতে ডাক-রানার চালু। দুর্গমতার জন্য চিঠির পরিমাণ কমে টেলি-

যোগাযোগের উন্নতির জন্য এখানে রানার-ব্যবস্থা হয়ত উঠে যাবে। তখন হর্ন বাজিয়ে, পতাকা উড়িয়ে পাহাড়ি গ্রামের লোকেদের বলা হবে হাটে যাওয়ার পথে চিঠি, টাকা, অন্যান্য জিনিস এই ডাকঘর থেকে সংগ্রহ করতে। পোস্টাল হর্ন তো সারা পৃথিবীতেই ডাক-যোগাযোগের প্রতীক। জার্মানির কোলন শহরে প্রথম শুরু। তারপর বিভিন্ন শহরে। কষাইরা যাতায়াতের সময় হর্ন বাজিয়ে সবার চিঠি সংগ্রহ করত। পয়সার বিনিময়ে জায়গা মতো পৌঁছে দিত। পোস্টমাস্টার পুষ্পরাজ বলছিলেন, যাতায়াতের পথে সেভাবেই লোক যাতে চিঠি নেয়, তার ব্যবস্থা করার কথা বলেছি। কলকাতা জি পি ওতে একসময়ে বিউগল বাজানো হত। ইংরেজ সেনারা এসে চিঠি সংগ্রহ করে নিয়ে যেত। শোনা যাচ্ছে সেরকমই হবে।

বাঘিনী ভক্তা :

ঘটনাটা সত্যিকারের নেকড়ে রামুর মতো। শুনেছিলাম অধ্যাপক সমাজসেবী দীপক নাথের কাছে। সুন্দরভাবে সেবামূলক কাজ করেন ওরা। পাথরপ্রতিমা ব্লকের বাঘিনীদের বাড়ি। এখন সে কিশোরী পড়ে দীপকবাবুদেরই একটি স্কুলে। বাঘিনীর বয়স তখন ছয়। বাবা-মা গেছিল সুন্দরবনের গভীর জঙ্গলে চিংড়িমাছের মীন, কাঁকড়া আর বুনোফুলের মৌচাক থেকে মধু আনতে। কাঁকড়া ও চিংড়ির মীন ধরা হয়েছে। একদিন ওরা ফিরছে একটা খাঁড়ির মধ্যে ওদের ছোট কাঠের নৌকো নোঙর করা। ওরা নেমেছে মধুর লোভে। একটু এগিয়ে বাবা। মার কোলে বাঘিনী। হঠাৎ জঙ্গল থেকে বাঘ বেড়িয়ে এল। বাঘিনীর বাবা কিছু করার আগেই বাচ্চা কোলে মাকে টেনে নিয়ে গেল। মানুষটার খাড়ির মুখে গিয়ে অন্য নৌকোর লোকদের নিয়ে সেদিন জঙ্গলে গিয়ে কিছু ঠাওর করতে পারল না। পরদিন ভোরে জঙ্গলে গিয়ে কন্যা শিশুকে মাটিতে পড়ে থাকতে দেখল। কাছাকাছি শুকনো রক্তের দাগ আর কোথাও কিছু নেই। মৌমাছির গুঞ্জন আর থেকে থেকে শিশুটির কান্না। শিশুকোলে বাবা অন্য মৌলেদের সঙ্গে ফিরে এল। শিশুটিকে লোকে সেই থেকে বাঘিনী বলে ডাকে। সে বড় হল। বাবা সেই ভয়ঙ্কর স্মৃতি নিয়ে পাগল হয়ে একদিন মরেও গেল। বাঘিনী এখন স্কুলে পড়ে। আশ্চর্য সেদিন সেই জঙ্গলে সারা রাতেও একটি পোকাও কামড়ায়নি।

একবার সজনেখালি বনবাংলোতে এক সদ্য বিধবার সঙ্গে আলোপ হয়েছিল। স্বামী বাঘের কামড়ে মারা যাওয়ায় ক্ষতিপূরণ হিসেবে তার বিধবা স্ত্রী চাকরি পেয়েছে। জিজ্ঞেসা করেছিলাম এই জঙ্গলে কাজ করতে আপনার আর ভয় করে না। বলেছিল টাইগার অ্যাক্সিডেন্টে মারা গেছে তো ভয়ের কি?

টিয়াপাখির বন্ধু :

আসানসোলের কাছে পাণ্ডবেশ্বর সেখানকার এক গ্রামে মনোতোষের বাড়ি। মনোতোষের তিনকুলে কেউ নেই। একটা ঝুপড়িতে থাকে। টুকটাক কাজ করে।

একদিন ঝড়ের মধ্যে বাড়ি ফেরার পথে দেখল রাস্তায় পড়ে আছে ভাঙা ডাল কোটরে টিয়াপাখির বাসা। একটি টিয়ার ছানা ঘুমপাড়াচ্ছে। মারাতো যাবে তাই তার ভয় নেই। মনোতোষের সঙ্গে টিয়া ছানাটি তার ঝুপড়ি বাড়িতে গেল। ধীরে ধীরে বড় হল। তারপর মনোতোষ যা খায় সেও তাই খায়। কিন্তু মনোতোষেরইতো খাবার জোটেনা। টিয়া আপন মনে গাছে গাছে ঘুরে বেড়ায়। নিজের টুকু নিজেই জোটায়। কিন্তু মনোতোষ ঘর থেকে বেড়লেই উড়ে এসে তার কাঁধে বসে। সে যেখানে যায় টিয়ারও ঠিকানা সেখানেই। রাতে মনোতোষ ঘুমায় টিয়া ঝুপটির চালে বাঁশে বসে থাকে। একদিন এক হুলো বেড়ালের কামড়ে টিয়ার আর্তনাদ শুনে মনোতোষের ঘুম ভাঙলো। কিন্তু টিয়াটাকে মনোতোষ বাঁচাতে পারল না। পাণ্ডবেশ্বরের বহু মানুষ আজও মনোতোষের কান্না ভুলতে পারে না।

আলেকজান্ডার রাফায়েল মিলার :

ঝাড়গ্রামের জঙ্গলে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের এই সাহেব সৈনিককে বছর কুড়ি আগে দেখেছি। তখন একটা আইন ছিল। যেসব পরিবারে একাধিক পুরুষ সন্তান তাদের একজনকে যুদ্ধে যেতে হত। ইছাপুর গান অ্যান্ড শেল ফ্যাক্টরির কর্মী রাফায়েল মিলারকে সেইজন্য যুদ্ধে যেতে হয়েছিল। রোডেশিয়ায় যুদ্ধ চলাকালীন এক বিস্ফোরণের সময় মিলার স্মৃতিভ্রংশ হয়। পরে যখন সুস্থ হল যুদ্ধ থেমে গেছে। ব্রিটিশ ভারত ভেঙে দুটি স্বাধীন দেশের জন্ম হয়েছে রোডেশিয়াও স্বাধীন রাফায়েলকে জিজ্ঞেস করা হল সে কোথায় যাবে। রাফায়েল নিজের ইচ্ছেতে সেই থেকে ঝাড়গ্রামের জঙ্গলে। পেশা ছিল বন্যজন্তু ধরে বিক্রি করা। সে কাজ করতে গিয়ে সাপের মোচড়ে ডানহাতের হাড় ভেঙে গেছে। সংরক্ষণের পর সে ব্যবসা বন্ধ। তার ইউরোপীয় বউ সিঙ্গাপুরে চলে গেছে। সাঁওতালি বউ মরে গেছে। তাদের সন্তানেরা ব্যাঙ্ককে থাকে। বাবাকে টাকা পাঠায়। রাফায়েল একা একা পাখির সঙ্গে কথা বলে। এ বনের বেশিরভাগ পাখির ডাক শুনে তার মানে বলে দিতে পারত। বহু পক্ষীতত্ত্ববিদ জীববিজ্ঞানী তাদের গবেষণার জন্য রাফায়েলের সাহায্য নিয়েছে।

বাজপাখির জিভ :

পূর্ব সিকিমে জুলুক থেকে পদমচেনে ফিরছি। তখন ভোর। পথের ধারে মোনাল বসে আছে। ছবি তুলতে গেলে একটু এগোচ্ছে আবার পিছন ফিরে পোজ দিচ্ছে। হঠাৎ একটা ছোট পাখির ওপর আর একটা বড় পাখি ঝাঁপিয়ে পড়ল। সঙ্গী গাইড, ফরেস্টার ছুটে গেল। সঙ্গে অন্যরাও। মাটিতে চিৎ হয়ে একটি ছোট্ট বাজ কাতরাচ্ছে। একটু জল দেওয়া হল। ফরেস্টার বললেন একটা বড় বাজ একটা ছোট বাজকে মেরেছে ওর ঘাড় মটকে গেছে জঙ্গলে নিয়মে আমাদের করার কিছু নেই। পাখিটা হাঁ করলো ওর সরু জিভটা উল্টে গেল।